সংক্ষেপিত বঙ্কিম রচনাবলী

কৃষ্ণকান্তের উইল

অশোক পুস্তকালয়
কলিকাতা

নিবেদন

সদগ্রন্থের প্রচার যত হয় ততই জাতির ও সমাজের কল্যাণ। কতকটা সেই উদ্দেশ্যে ও কতকটা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী সহজবোধ্য করবার ও বহুল প্রচারের মানসে গ্রন্থগুলিকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। তুর্দিনে বাঙালির মনে আশা, বাঙালির মনে জাতীয়তা-জ্ঞান জাগ্রত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তাকে ভালবাসতে ও তার জন্য প্রাণত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু তাঁর ভাষা, ভাব ও রচনা-কৌশল তাঁকে এতদিন সাধারণ পাঠকের অনায়ত্ত করে রেখেছিল। তাঁর রচনাবলী ছিল উচ্চ-শিক্ষিত ও সাহিত্য-রসিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকাল বুঝি সে গণ্ডীও সঙ্কুচিত! মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-কলাদির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলি যদি নিম্নস্তরের হয়, তা হলে সাংস্কৃতিক জীবনের গতিও নিম্নপথে ধাবিত হয়ে থাকে। সেইজন্য যা সৎ, যা উৎকৃষ্ট, যা মনুষ্যত্বকে ফুল্লকমলের মত প্রস্ফুটিত করে, তারই প্রয়োজন। বলা অনাবশ্যক যে বঙ্কিম-রচনাবলী এইরূপই গুণশালিনী।

বঙ্কিমের রচনাবলীকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করতে হলে তার কিয়দংশ পরিবর্জন অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই স্থানে স্থানে তা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সুমধুর ভাষা, মৌলিক ভাবসম্পদ ও অতুলনীয় রচনা-কৌশলকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি এবং গল্পাংশ

অক্ষুণ্ণ রাখতে মধ্যে মধ্যে নিজের রচনার অনুপ্রবেশও করানো হয় নি। আরও একটি কথা বলা দরকার। গ্রন্থগুলি যাতে কেবল বয়স্ক সাধারণ পাঠকগণের উপভোগ্য হয় সম্পাদনকালে আমাদের দৃষ্টি কেবল সেই দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাত্রগণও যাতে রসাস্বাদ করে তৃপ্ত ও উপকৃত হয়, সেদিকেও দৃষ্টি ছিল।

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৫৯

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী। তাঁহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমন সন্দেহ কস্মিন্‌কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি রামকান্ত রায়ের মনে মনে সঙ্কল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব করিতে

লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশত তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমন অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন-পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দান্ত; পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ। বাঙালীর উইল প্রায় গোপন থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল দেখিয়া শুনিয়া, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা-বহিন্‌কে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু্‌ হরলাল, বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে,—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্মার্থ এই—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবা বিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে আট আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজেস্টারি করেন, তবেই এ অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,—

"তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, বিধবাবিবাহ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভালমানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখাপড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও, নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী, কিন্তু তাহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোনমতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমন সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি বড় বাবু যে, কখন্ বাড়ি এলে?

হর। বাড়ি এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য?

ব্র। কর্তা এখন রাগ ক'রে তাই বল্‌ছেন, কিন্তু সেটা থাক্‌বে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি কর্‌ব ভাই! কর্তা বলিলে ত 'না' বলিতে পারিব না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজকার করিবে?

ব্র। কিল্‌টে চড়টা? তাই ভাই, মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা। আরম্ভ কর। আগাম কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও।

ব্র। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজা মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়। তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সেতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতেই উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিলেন, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়িতে কি দোয়াত-কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে, ভাল বলেছ ভাই রে!

তখন হরলাল দুইখানি জেনারেল লেটার কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারী নহে—কিন্তু উকিলের বাড়ির লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্য এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি-কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্মার্থ এই—কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে ২ত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা—বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল, দস্তখত করে কে?"

"আমি" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল উইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্র। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার এই পিরাণের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি-কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখানি উইল দেখিতে এক প্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে, শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্তাকে দিয়া কর্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল।

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে! তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও!" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বলি, ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইলখানি আনিয়া দিলে, আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না?

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্ত-কৌশল-বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্ত-কৌশলের প্রশংসা

করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় লইল।

হরলাল চলিয়া গেলে, ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়-সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময় যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হরলালের এ টাকা হজম করা ভার,—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়! ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,—

"মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে,
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।"

হর। পার নাই না কি ?

ব্র। ভাই, কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই ?

ব্র। না ভাই—এই ভাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্মা, স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না ? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্পমাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবনসংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "সে ভাবনা করিও না। কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।"

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন।

হরলাল ঘরের ছেলে, সর্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। পাক-শালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ-গুণ কিছু বলিতে হয়। বলিতে হয় যে রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিল কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়। আবার আলিপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল; দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে হরলাল বাবু জুতাসমেত মস্-মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রোহিণী দালের কাঠি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-কাকা কবে এলেন ?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল ; বলিল, "আজি এখানে খাবেন ? সোরু চালের ভাত চড়াব কি ?"

হর। চড়াও, চড়াও ; কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি ?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটিপানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে ?"

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল ডাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা—জন-কতক বদ্‌মাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। সেই দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল ?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কী-বেহারা করিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি! সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার—করিবে ?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতেও নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল ইহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাটীতে তোমাদের যাতায়াত আছে, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি, এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না?

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন মরিব; কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি! তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ

আজি যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোশামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবাবিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা বিধবাই হৌক, আর সধবাই হৌক—বলি, বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন, সকলেরই তা হ'লে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম-সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন-গোড়ায় বসিয়া ডালে কাঠি দিতে আরম্ভ করিল।

দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্যন্ত গেলে রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময় কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়ন-মন্দিরে পর্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, শট্‌কায় তামাক টানিতেছিলেন এবং আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী ?"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে ?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম, ঠিক বলেছ ! বৃন্দাবনে গোয়ালা-বাড়ি মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা! আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখতে এসেছি?

কৃষ্ণ। তাই ত। তবে কি মনে করিয়া? আফিম চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধ'রে দিতে পার্‌বে না, তাহার জন্য কি আমি এসেছি? আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। এই—এই! তবে আফিমেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য—আফিম চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি? আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তাতে তুমি দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখার দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেস্ট-ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চশমা বাহির করিয়া

নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু চশমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারিবার আফিমের ঝিম্‌কিনি আসিল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে, কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড়ো হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

গভীর নিশীথে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত; কিন্তু সে রাত্রে দীপনির্বাণ হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমনও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কেহ একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমনও বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্যঙ্কের শিরোদেশ পর্যন্ত আসিল,—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্ধনিদ্রিত,—কখনও অর্ধ-সচেতন,—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। হঠাৎ যেন চাবি-খোলার শব্দ অল্প কানে গেল। হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্‌কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশত ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল ; সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক এক জন খানসামা তাঁহার প্রহরি-স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি !"

কৃষ্ণকান্ত বারেকমাত্র হরিকে ডাকিয়া আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল তাঁহার গৃহ হইতে এই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে, ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মানন্দ বাড়ি ছিল না, নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ, হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল—আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে

হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়াছিল। উইল-চুরির কথা শেষ হইলে, রোহিণী হঠাৎ উইলখানি হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া, হরলাল জিজ্ঞাসা করিল,"উইল কোথায় রাখিয়াআসিলে?"

রোহিণী। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রো। এখনই যাইবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রো। তা যাও।

হর। উইল?

রো। আমার কাছে থাক।

হর। সে কি? উইল আমায় দিবে না?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে উহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল! যখন আপনি বিধবাবিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল। বলিল, "তা হবে না—রোহিণি, টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য ?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল ; বলিল, "আমি চোর ! তুমি সাধু ! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল ? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল ? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল ? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে ! হায় ! হায় ! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর-ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষমানুষ, মানে মানে দূর হও !"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময়, একটু টিপিটিপি হাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসীচাকরাণীর বড় ধার ধারে না।

সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরাদন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের বড় একটা পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়; দল বাঁধিয়া, যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা হাসিতে হাসিতে, হাল্‌কা কলসীতে হাল্‌কা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে।

রোহিণীর কলসী ভারি, চাল-চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি পরা, আরও কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্য কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে। রোহিণী চাহিয়া

দেখিল—সুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন-গৌর স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত। দেখিল—সরোবর-তীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়; বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। রোহিণী সোপানে অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে! সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং

উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বেশ জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাথর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা-বাড়িগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগানফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না! আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ি সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িলেন। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালবাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এই পাড়ায় কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয়, ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীতে কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না?

শেষে সূর্য অস্ত গেলেন। ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ ; আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিব না ?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন—"রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না ? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল, গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবর-সোপানের শোভা বর্ধিত করিতে লাগিল। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া, কলসী ভরিয়া তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন বক্—বক্—গল্ গল্ করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে, রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী-কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়।

যাহা হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র। দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।

কেন যে এতকালের পর তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজ হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্ত তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে —দেরাজ খুলিয়া, যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী

যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল! কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতীকারার্থ—বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও, সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে রোহিণী সুন্দরী প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ, সদর-ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া অর্ধ-নিমীলিতনেত্রে, অর্ধরুদ্ধকণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিল, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী"। সখী বাটীর এক জন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক পূর্বপরিচিত

পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেল—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কান পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকা-গর্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্বাপিত করিল! পরে পূর্বমত চাবি সংগ্রহ করিল এবং পূর্বমত অন্ধকারে দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণ-কান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কান পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিল যে, নাসিকা-গর্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিল, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা; বোধ হয়, একটু ভয় হইয়াছিল;—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কানে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।"

রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না হরি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আ'লোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে দেরাজের কাছে স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে ?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে ?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ-রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম, বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না।"

এই বলিয়া রোহিণী দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ হাঁ, ও-কি ফাড় ? দেখি দেখি," বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার

করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি ?"

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল! উইল! আমার উইল কোথায় ?"

রোহিণী। আপনার উইল দেরাজের ভিতরে আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা—নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত ?"

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন। উইল-খানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি ?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল ? জাল উইল কে করিল ? তুমি তাহা কোথায় পাইলে ?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে ?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র-বুদ্ধির ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয়সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারী। বোধ হয়, তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তারপর ধরা পড়িয়া, ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ! ঠিক কথা কি না?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে, তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয়, করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়ন-পথ মুক্ত করিয়া সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা-গন্ধরাজ-কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাত-বায়ু সেবন জন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলুম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "স'বে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে-ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন।"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ।"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা! গালি খাইলে যদি বাঙালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এ দেশের লোক এত দিনে

সগোষ্ঠী বদহজমে মরিয়া যাইত। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা! আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাহার পিতামাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা।" সার্থকতাবশত সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী-মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্বনাশ!" "কি আস্পর্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি-টিটকারী ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী-সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ীননদ ছিল, তার পর ভ্রমর আবার নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল।

বহুকষ্টে ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি—কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে

ভ্রমর বলিল, "কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি ?"

১ নং। রোহিণীঠাকুরুণের—আর কার ?

২ নং। সেই আবাগীই সর্বনাশের গোড়া।

৩ নং। সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

৪ নং। যেমন কর্ম, তেমনি ফল।

৫ নং। এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, 'রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জান্লি ?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে ?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল?

গোবিন্দলাল হাসিল। বলিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের বিশ্বাসই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই!" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল,—"কোথায় যাও?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর-কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালে কাছারিতে বসিয়াছিলেন, গদির উপর মস্‌নদ্ করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় অম্বুরী তামাক চড়াইয়া মর্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপার্শ্বে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর একপার্শ্বে নায়েব, কারকুন, মুহুরী, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা, অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠামহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথার কি

উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি? শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, এ কাতর কটাক্ষের অর্থ—ভিক্ষা।

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার! সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ, তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠামহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কানে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠামহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "কি হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্বিক গতরাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার

কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণী?"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্‌জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি? আমিই থানা, আমিই মেজেস্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোহিণী?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি ?"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি ?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময় আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি তাই। বাবাজীর কিছু গরজ দেখ্‌ছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু কর্‌বে! একালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর একচাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগ্‌দীকে বলিলেন, "ওরে! একে সঙ্গে করিয়া একজন চাকরাণী দিয়া মেজ বৌ-মার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্ যেন পালায় না।"

নগ্‌দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি ?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া, ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে-অঞ্চল হইতে পলাইল।

এ দিকে গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া আর্যকন্যা। বলিল, "কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।"

গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি ?

রো। বলিয়া কি হইবে ?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত ?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না ?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে ?

রোহিণী বলিল, "কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে ?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন ?

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যদি পারি, কর্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমার কি করিবেন ?

গো। শুনিয়াছ ত ?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার।

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণী! কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম, যে দিন আসল উইল লেখাপড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া আসল উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলালবাবুর অনুরোধ।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কাল রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার জন্য!

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড়বাবুর বারো আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহুকষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না, অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণী?

রো। সেই বারুণী-পুকুরের তীরে মনে করুন।

গো। কি রোহিণী?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম; কিন্তু সে আপনার বাড়িতে নহে।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ যে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনি ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা-শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল, তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি, কিন্তু কোথায় যাইব ?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ি কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে ?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে ?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন ?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না ?

রো। পারিব, কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে ? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন ?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য ; তোমার জন্য কর্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়িতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না। বড় লজ্জা করে, ছি ! অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন ; কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্ধশয়নাবস্থায় আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদস্থরে গমকে গমকে তান-মূর্ছনাদির সহিত নানাবিধ রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে তাঁহার মন অহিফেন-প্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানাস্থান পর্যটন করিতেছে।

কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিক্‌দানির উপর পড়িয়া গেল এবং নল, বাটা, পিক্‌দানি, সকলই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া

দেখেন যে, মূর্তিমান্ স্কন্দবীরের ন্যায় গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠামহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিক্‌দানিটি উঠাইয়া, সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই, এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী-পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া আপনি জমিদারীর কথা পাড়িল—জমিদারীর কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি, রোহিণীর দিক দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী-পুষ্করিণী-ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায় ?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল ?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল—"আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

“এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না। আমি কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ি যাব। আর কোথাও না!”

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?”

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না, জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "ভাবছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাবছ না? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? আমি অন্য মানুষ ভাবিতেছি।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো-আধো মৃদু-মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ কাকে ভাবছ, বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না?

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌বো, বল না?

গো। সিয়াকুলকাঁটা! রোহিণীকে ভাবছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম। সে রাজী হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া একজন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি, ওরফে ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল। মোটাসোটা—গাঁটা-গোটা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি, রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন, কি বলতে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্লেন, 'তুমি মর'।"

"এই?—যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা, বলিয়া আয়—যে, বারুণী-পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় দিয়ে— বুঝেছিস্?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল, আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী-পুকুরের কথা বলেছিস্?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। বলিল যে, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারিবার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে উদ্যানমধ্যে এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকা-মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরক্ষোদিত স্ত্রী-প্রতিমূর্তি।

সেইখানে আজি গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসী কক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জনা করিবার সম্ভাবনা —দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এদিক-ওদিক বেড়াইলেন। শেষে মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই, কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে

আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণী এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী-পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন, সর্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটেব নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

ষোড়শ—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া রোহিণীকে উঠাইয়া সোপান-উপরি শায়িতা করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিতা আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীনা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসরহিতা।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারিবার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া জল উদ্গিরণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্ধ্বোত্তোলন করিলে অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়; পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে নামাইতে হয়, নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়। তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনি নির্গত হইয়া আইসে ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য স্বত পুনরাগত হইতে থাকে। কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে।

গোবিন্দলালের এক সহায় উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্বে গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটা তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি।"

মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক, আমি ফুঁ দিই, তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল।

সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল। গোবিন্দলাল তখন রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল ; আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন, আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

রোহিণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—এক দিকে স্ফটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবন-প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ, এই যথেষ্ট !"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?"

গো। তুমি মরিবে কেন ?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই ?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপপুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশি কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয় তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ, ফিরেবার যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ-সব কথায় কাজ নাই, চল, তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছুই বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্ম-জয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখন কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ—কথাটা ভাল কথা নহে। আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইয়াছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর,—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে-কথা শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও! আমার শুনিবার বড়ই সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে!"

কেমন একটা বড় ভারী দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলালবাবু জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে আমি মরিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না। বিনা তদারকে মহাল সব খারাপ হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন,—"আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উস্যুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,—বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। বন্দরখালির কথা শুনিয়া আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু দেহাতে যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল, তারপর উঠিয়া অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুলসকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছসকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল,—চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল,—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় গরম। খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরিগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ন সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা

করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌতবস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণির সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত,—জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত, ঐ পর্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল, "আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি-পাচন কাড়িয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল; ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বৌঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? তুমি মরিতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয় ত হুঁকার নল মুখে দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল।

ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বক্‌বি ত আমার কাছ থেকে উঠে যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড়-চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলি না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচী চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি—সেদিন অত রাত্রে রোহিণী বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকালবেলা ভ্রমরের

কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না, কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাক্‌রুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে —তোমারই জন্য আমরা বলি। তা আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুই কর্‌গে, আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচী চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা ”

তখন সকালবেলা। উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এদিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে, সজল নয়নে, যুক্তকরে মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?"

একবিংশ—দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগদ্বেষাদ কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কানে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া কলসীকক্ষে বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী বাবুদের বাড়ির পাচিকা, সেই সময়ে বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর—আর বড় লোকের কাজ করা হ'ল না—কখন্ কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, ডান হাতের কাচা কাপড়-খানি বাঁ হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল, বলিল, "দেখ দিখি গা, পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা আমরা চাকর-বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না?"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল। রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরদা?

ক্ষীরদা মেজবাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, যে যেদিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূরে গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মা'র দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল।

এইরূপে ক্ষীরোদা পথে যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্মপীড়ার পরিচয় দিয়া পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশির মধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে হরমণি যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজবাবুর বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। যে সূর্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্বে গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। 'মেজবাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।' কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, ভ্রমরকে জানাইল যে, "ভ্রমর, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো-কুৎসিতের এত সুখ, অনন্ত ঐশ্বর্য—দেব-দুর্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর?

গ্রামের লোকের এত সহিত না ; তাই পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন—"ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে !" কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এখন ভ্রমরের যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা ; কথা যদি রটিল, রোহিণীর কানেই বা না উঠিবে কেন ? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম, সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই। কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই ; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার ? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বারাণসী শাড়ি ও এক সুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া এক-একবার কাঁদিতেছে, এক-একবার চোখের জল মুছিয়া কড়িপানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া

উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সেদিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে; আজ রাত্রে আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ নাকি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, "তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।" প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজবাবুর অনুগ্রহে আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে-কথা কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা আর এই শাড়িখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বারাণসী শাড়ি ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, পুঁটুলি বাঁধিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদ্‌লাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে-সকল কিছু হইল না। তেড়াবাঁকা ছাঁদে যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল—"স"গুলা "ম"র মত হইল—"ধ"গুলা "ক"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক পৃথক অক্ষর; কোন কোন অক্ষরের লোপ—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমন নহে।

যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিব বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

"তুমি মনে জান, বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেকবার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন, তার পর সেই পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন, কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ-দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার

দিয়াছ। আরও কত কদর্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে,—যাহা হউক, তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নইলে আমি এখানকার বাস উঠাইব ইতি।”

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন!—ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, “এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না, আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।”

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ণ মনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে,—নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পূরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানি পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, “আমার বড় পীড়া হইয়াছে।

তোমরা যদি একবার লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া-বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি কাল লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।"

এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া, স্বামীকে কিছু গালি দিলেন এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা-পাল্কী লইয়া চাকর-চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে; ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন, ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাসদাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ-দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্তব্য। ও-দিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িত, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড়

অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাহার সম্মতি পাইয়া কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না। ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক-একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক-একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ-কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি?

শেষ দুর্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু

হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, এক জন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দ-লালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি? আজ ঘাটে নামিও না, বড় পিছল।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয়, বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানাভিমুখে চলিল। উদ্যান-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতে-ছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার, তা বলিতেছে। সে-কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ-কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না, আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কানে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন, কিন্তু সর্বদা তিনি সেবকগণ-পরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব-নিকাশ হইয়া আসিল, এ জীবনের সাগর-সঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে বুঝি বলা হইবে না। একদিন

গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেইদিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?"

কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নাই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবন-প্রবাহ অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে! গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন—কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন, কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তেমন কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্য-শরীরে শঙ্কা কখন্ নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন। বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবনজন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন,

কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন, তাহার পর ঔষধটুকু সমুদয় পিক্‌দানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না। কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিয়রে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিশের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা, মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখনই নায়েব, মুহুরি, গোমস্তা, কারকুনে,—চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্যে—ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্তে ঘর পূরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে, সব সেইরূপ কেবল—"

"কেবল কি ?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল, গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, "লেখ।"

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ সাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল উপযাচক হইয়া তাহাতে সাক্ষিস্বরূপ সাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসী-তলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজেকাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া

পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠশ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে, গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে। মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর! তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে, কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে-সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না। শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে-সকল কথার প্রসঙ্গে কোন কাজ নাই।"

ভ্রমর অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল; দাসদাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, এ চারু প্রেম-প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে।

অষ্টাবিংশ—উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তারপর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল।

দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল। শেষ উইল পড়ার মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী, কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র! কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়,—তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল; কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠশ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী—আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বৈ ত নই?

গো। আজিকালি ও-কথা সাজে না, ভ্রমর।

ভ্রমর। কি করিয়াছি? তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিতা, তোমার খেলিবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর। আমি কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী!"

ভ্রমর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছে—"ক্ষমা কর! আমি বালিকা।"

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদ ত্যাগ করিল, উঠিল; বাহিরে যাইতেছিল, চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্ছিতা হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকারমাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। তিনি যদি এই সময় সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন; কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু

বিদ্বেষ-ভাবাপন্নও হইয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্য হইয়া ইহজীবন নির্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল, তুমি পুত্রের কাজ কর, এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিল। কেহই তাহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন-হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল ; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্মের কি বুঝি?

মা,—সংসার সমুদ্র—আমাকে এ-সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন,—"তোমার বড় ননদ রহিল, সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল, বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তারপর স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূরে শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভযাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন-সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন। পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে গোবিন্দলাল শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন।

তুমি আসিবে না কি ?” এ-কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, “তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।”

ভ্র। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি ?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে, তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্র। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জনা হয় না ?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্র। তা নয়, আমি এবার বাপের বাড়ি গিয়া বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, “পড়।”

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র, ভ্রমর উচিত মূল্যের স্ট্যাম্পে আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছে। তাহা রেজেস্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, “তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ, কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে, তুমি বিষয় দান করিবে,

আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।” এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, “পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারীতে ইহার নকল আছে।”

গো। থাকে থাক। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন?—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—যোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর,—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন, মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে।”

এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়িতে সংবাদ আসিল—গোবিন্দলাল মাতা প্রভৃতি সঙ্গে নির্বিঘ্নে সুস্থশরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল, পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাড়ি যাত্রা করিয়াছেন। ভ্রমর বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ি আসিবেন, এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে, বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে, আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তারপর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে, একাই গিয়াছে,—কে সঙ্গে যাইবে ?

এদিকে তিন চারি মাস গেল,—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না, ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই! কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন,—কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ-সংবাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—"আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান।" শাশুড়ী লিখিলেন, "তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আপাতত দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।"

এদিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল! আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখিলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে, জানি না। কোন সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ; তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত— অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন। ভ্রমর অনেক কাঁদিল। শেষে উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয়, আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্মকর্ম করাও। আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত-নিয়ম করিব। কে এ-সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন। বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্বনাশ করিয়াছে, আমি তাহার এমনি সর্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত-নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন, ব্রত-নিয়ম করিতে গেলে অনেক

উপবাস করিতে হয়, এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক।"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মাধ। সারিবে, মা—কি হইয়াছে? তোমার একটুও এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই—শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ি রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি দুই দিন এখানে থাকিব, তারপর তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য-কারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ-সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মাতাঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল! অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্তব্য, সেই পামর-পামরী কোথায় আছে! নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে-সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে, পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, "যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথাই আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।"

এইরূপ স্থির-সংকল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ি হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোস্ট-আফিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে নিরীহ ভালমানুষের মত সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনের টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি-পোস্টমাস্টার বিরাজ করিতেছেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলের আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া পোস্টমাস্টার ওরফে পোস্টবাবু গম্ভীরভাবে পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। বাবু আপাতত চিঠি ওজন করিতেছিলেন এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে

প্রশান্তমূর্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া পোস্টমাস্টারবাবু আপাতত পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মাধবীনাথ সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "হাঁ—হাঁ—তু- তুমি— আপনি ?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম।"

তখন পোস্টমাস্টারবাবু বলিলেন, "বস্থন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন। পোস্টবাবু ত বলিলেন "বস্থন", কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবিশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোস্টমাস্টারবাবুর হরিদাস পিয়াদা একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল।

মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ ? তোমাকে দেখিয়াছি না ?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামাকু সাজ দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজীও কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজী মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারিগণ্ডা বক্‌শিস্ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার তল্লাসে ধাবিত হইল।

মাধবীনাথ আদৌ তামাক খান না—কেবল হরিদাস বাবাজীকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফর্‌মাইস করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোস্টমাস্টারবাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোস্টমাস্টারবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন, তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্যদিকে যেমন নির্বোধ হউন না কেন, আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধবী। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোস্ট। চি'ন না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজ মূর্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোস্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোস্টমাস্টারবাবু তখন আপনার উচ্চপদ স্মরণপূর্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্যে কিছু

সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব, এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি।"

তখন পোস্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন্?"

মাধ। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠিপত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মাধ। কত দিন অন্তর?

পো। যে-কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন, তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোস্টমাস্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখছি—আমায় চেন কি?"

পোস্টমাস্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন, আমরা কি পোস্ট-আফিসের খবর যাকে তাকে বলি? কে তুমি?"

মাধ। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ি রাজগ্রাম! আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে, খবর রাখ?

পোস্টবাবুর ভয় হইল—মাধবীবাবুর নাম ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ শুনিয়াছিলেন। একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল,

মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব, আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারী টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে ?”

পোস্টবাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন, “আপনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না। বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।”

মাধ। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পোস্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মাধ। তবে রেজিস্টারী করিয়াই চিঠি আসে ?

পোস্ট। হ্যাঁ—প্রায় অনেক চিঠি রেজেস্টারী করা।

মাধ। কোন্ আফিস হইতে রেজেস্টারী হইয়া আইসে ?

পোস্ট। মনে নাই।

মাধ। তোমার আফিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না ?

পোস্টমাস্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া কহিলেন, “প্রসাদপুর।”

“প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিস্টি দেখ।”

পোস্টমাস্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিস্টি দেখিয়া বলিল, “যশোর।”

মাধ। দেখ তবে, আর কোথা কোথা হইতে রেজেস্টারী চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোস্টবাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোস্টমাস্টারবাবুর কম্পমান হস্তে

একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজীর হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্য একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোস্টবাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতন-কাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী ও গোবিন্দলাল এক স্থানে গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোস্ট-আফিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজেস্টারী হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সব্-ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "একটি কন্‌স্টেবল পাঠাইবেন; বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।"

সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র নিদ্রাসিংহ কন্‌স্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দিমিন্দি কইও না—যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমনভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরের স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহার ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ-আপদ পড়িলে আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ কি মহাশয় ?"

মাধবীনাথ বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদগ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ মহাশয় ?

মাধ। বিপদ সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি ? আমার কাছে চোরা নোট ?"

মাধ। তোমার জানা চোর না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজটা ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিসেও জানিয়াছে। পুলিসের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ, একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত জলধরসন্নিভ কন্‌স্টেবলের কান্তমূর্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল; মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই, এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি? পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ, এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে—কন্‌স্টেবল গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান্ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কন্‌স্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ উর্ধ্বশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় চলিলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন; নিষ্কর্মা বলিয়া সর্বদা পর্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিন্‌ব।

নি। চল।

তখন উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু একদিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুরে যাইবেন।

পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই। প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক

ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে। এক জন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচি-বিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া এক জন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কান মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটু তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতে স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া এক জন যুবাপুরুষ নভেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খান্-খান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষার-ধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুবতী সেই রবের সঙ্গে আপনার কোমলকণ্ঠ মিলাইয়া, গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে সোনালি রুপালি রকম এক প্রকার গীত হইতে লাগিল।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী—এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইঁহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেস্থরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল, গোবিন্দলালের হাতের নভেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে এক জন অপরিচিত যুবাপুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ-পর্দানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনই গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—স্থতরাং সেখানে বহির্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছে গা এখানে ?"

গোবিন্দলালের সোনা ও রুপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল—নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল। নিশাকরও বেশভূষাসম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন ?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোনা। কি নাম বলিব ?

নিশা। একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোনা ইতস্তত করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নি। তবে তোমরা থাক, আমি বিনাসংবাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোনা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোনাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি, —যখন আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোনার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে, তখন বাবু কোন কার্যবশত অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এদিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার উর্ধ্ব দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল—এ কে? বোধ হইতেছে—এ দেশের লোক নয়; বেশভূষার রকম সকম দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, বড়মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রং ফরসা—কিন্তু এর মুখ-চোখ ভাল। বিশেষ চোখ। আ-মরি! কি মুখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়--সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটা কথা কহিতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমন সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল।

এমন সময়ে রুপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, "একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রুপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা ক'রে খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রুপো উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'বাবুর কাছেই বলিব'।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই বা করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না

করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সোনা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানেই উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস ?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন ?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া, যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা, তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনি বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া!"

নি। আমি তাহা পত্তনি লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সেজন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়্কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শূয়ার গুণচো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহেব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদায় দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়-গুলি পত্তনি দিতে স্বীকার হইয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ! তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না, পত্রাদিও লিখিতে ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিল না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর! প্রায় দুই বৎসর হইল।

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই, পূর্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয়, তাহা জানেন। তাঁহার যাঁহাকে ইচ্ছা পত্তনি দিবেন, আমি কিছুই লিখিব না। বোধ হয়, এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজেকাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল; তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাইব?"

"যা খুসি" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন. গোবিন্দলাল পূর্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজি আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গৎ সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নভেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা

পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোনা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল সোনাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুই-ই।

সপ্তম—অষ্টম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল, সকলই কান পাতিয়া শুনিল; বরং দ্বারের পর্দাটি একটু সরাইয়া নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পর্দার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রুপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পর্দার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইসারায় রুপোকে ডাকিল।

রূপো কাছে আসিলে তাহাকে কানে কানে বলিল, "যা বলি, তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বক্‌শিস্ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল, আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা, উনি আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না,—তার জন্য কত কাঁদি। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা! এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখিতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি-মিনতি করিস্।

রূপো বক্‌শিসের গন্ধ পাইয়াছে—"যে আজ্ঞা" বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি নীচে আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে রূপো খাসনামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি—"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি?

রুপো। আজ্ঞা, তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রুপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর-আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায়সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব ত' আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়িতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে ?"

রুপো। আজ্ঞে, তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ-ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মাতাঠাকুরাণী নীচে আস্‌বেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি ? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন ; কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি ?

রুপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল ; নিশাকর বলিতে লাগিলেন,— "এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পূরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু'ঘা লাঠি মারিবে—অতএব এমন কাজে আমি নাই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা—তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মাতাঠাকুরাণীকে

সেই কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম ; কিন্তু তোমার বাবু তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রুপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না ?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠীর নিকটে নদীর ধারে একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুলগাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা ?

রুপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মাতাঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পূরিয়া যে আমাকে কুকুরমারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রুপো রোহিণীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না, আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই। রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে-কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্লমনে গাত্রোত্থান করিলেন।

রুপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বাবুর কাছে কতদিন আছ ?"

সোনা। এই যতদিন এখানে এসেছেন, ততদিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই ? পাও কি ?

সোনা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক-পোশাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের পোষায় কি ?

কথাটা শুনিয়া সোনা খানসামা গলিয়া গেল, বলিল, "কি করি, এখানে কোথায় চাকরী জোটে ?"

নিশা। চাকরীর ভাবনা কি ? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোনা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে গেলে যাবে কি, অমন মুনিবের চাকরী ছাড়বে ?

সোনা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব-ঠাক্‌রুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত ?

সোনা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ, পারবে কি ?

সোনা। ভাল কাজ হয় ত পারব না কেন ?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোনা। তবে এখনই বলুন, তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাক্‌রুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে,—রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ

করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার করিয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আস্‌তে পার?

সোনা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখবে, ঠাক্‌রুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তারপর আমার সঙ্গে জুটো।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সোনা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীর-শোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়া-প্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহু-বিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তরমধ্যে কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! এক জন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্তব্য, যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য বন্ধুর নিকটে স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব, পাপস্রোতের রোধ করিব, ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়, সোজা

পথে গেলে অত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে।”

এই চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে গা?”

রোহিণীও সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, “তুমি কে?”

নিশাকর বলিল, “আমি রাসবিহারী।”

রোহিণী বলিল, “আমি রোহিণী।”

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন?

রো। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারি নে। কি জানি, কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নি। কষ্ট হোক্, ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রো। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হ'লে আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এ-দেশে আসিয়া ছ, আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এমন সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেরে?”

গম্ভীরভাবে কে উত্তর করিল, “তোমার যম।”

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতকম্পিতস্বরে বলিল, “ছাড়, ছাড়। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।”

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থানে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকমধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে।"

গোবিন্দ। এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।" ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; রোহিণী সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিলেন, "রোহিণি!"

রোহিণী বলিল, "কেন?"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। যতদিন পায়ে রাখেন, ততদিন দাসী, নইলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি; তুমি কি, রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম—তুমি কি, রোহিণি, যে

তোমার জন্য ভ্রমর,— জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর, তাহা পরিত্যাগ করিলাম ?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ-ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গো। "রোহিণি, দাঁড়াও।" রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে, আবার মরিতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল, অতি কাতরস্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন ? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন, পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে ?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যেদিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সেদিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহস নাই। ভাবিল, "মরিব কেন ? না হয়, ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন ? ইঁহাকে যে, মনে ভাবিব, দুঃখের দশায়

পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন ?”

রো। মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ, বিদায় দাও।

গো। “দিই।” এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল,—“মারিও না, মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি, আমায় মারিও না।”

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট করিয়া শব্দ হইল। তারপর বড় শব্দ। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপো প্রভৃতি ভৃত্যেরা দেখিতে আসিল। দেখিল, বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠীতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশত থানা সে-স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল

ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বাঁধিয়া ছান্দিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্র এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায়—কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না, তাঁহার নাম পর্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নামধাম প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চূণিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা এ পর্যন্তও জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে-ওকে ধরিয়া জবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে এক জন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নামধাম অবধারিত করিলেন। ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায়

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই। এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনাখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চূণিলাল দত্ত আপনি স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন। ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশ মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দ-লালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট বলিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল, এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়িতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয়, কোন আপদ্ থাকিবে না।"

ভ্রমর আপদ্ থাকিবে না কিসে ?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলালবাবু, তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল ? তবে আর জানে না কি প্রকারে ?

যামিনী। তা না হয় জানিল। তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব ?"

যামিনী। কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলালবাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্রমর। আমার কোন ভরসা নাই।

যামিনী। যদি আসেন ?

ভ্রমর। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন ; যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানে থাকা কর্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হবেন ? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি, না হয় আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেইখানেই থাকা কর্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না, কোন সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। তারপর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিত্য শরীরক্ষয়—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তারপর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহর আনিয়াছে, যশোহরে তাহার বিচার হইবে।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকটে আসিলেন। ভ্রমর তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিল, "বাবা,এখন যা করিতে হয়,কর ! দেখিও, আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, নিশ্চিন্ত থাকিও —আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোনও চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহর যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্স্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রুপো সোনা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোনা নিশাকরের কাছে ছিল—রুপো কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, "গোবিন্দলাল ওরফে চূণিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন। আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গোবিন্দ-লালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন. মাধবীনাথ পৌঁছিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নামধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ি গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ তা বলিয়াছ, এখন জজ সাহেবের কাছে বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত টাকা দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলপের দায়ে যে মারা যাইব।"

মাধবী। ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগকে মারপিট করাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।

সাক্ষীরা চতুর্দশ পুরুষমধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাঠগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলপ পড়িল। উকিল-সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চূণিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই—না,—মনেও হয় না।

উকিল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকিল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকিল। প্রসাদপুরের কুঠীতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠীতে যাই নাই।

উকিল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে ?

সাক্ষী। শুনিতেছি, আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকিল। খুনের বিষয় কিছু জান ?

সাক্ষী। কিছু না।

উকিল তখন সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে ?"

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকিল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে ?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমি লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল ; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকিল-সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আচরণ-সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ বিপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলার পরোয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কানে কানে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার বাস অমুক স্থান।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, "গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ি আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না" মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল; কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, বলিতে পারি না।

এদিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়া প্রসাদপুরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। কেবল বাড়িটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট-চৌকাট পর্যন্ত বারো-ভূতে লইয়া

গিয়াছে। গোবিন্দলাল বাড়ির অবশিষ্ট ইট-কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন ছয় বৎসরের পর গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তারপর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয় আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে, তাহা হইলেই জানিব যে, ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তারপর শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয় তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,—

"ভ্রমর!

"ছয় বৎসরের পর এ-পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও, না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয়, সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্মফল, তুমি মনে করিতে পার,

আমি তোমার মনবাখা কথা বলিতেছি। কেননা, আজ আমি তোমার কাছে ভিখারী। আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি!

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান, সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই!

"তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ-কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ-কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ি তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি, আমায় স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত-পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর বিরলে বসিয়া নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকার-শূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিলেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল।

লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও, আমি উহা দান করিয়াছি।—যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজেস্ট্রি আফিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখন বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজ সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ি আপনার।

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ি প্রস্তুত করিব, পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার বাড়ি প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব, আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল। কি ভয়ানক

পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই! গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আমার একটি নিবেদন, বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে —আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না- আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন, ঔষধ সেবন এখন বৃথা।

এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি-তামাসা আরম্ভ করিল, ছয়

বৎসরের পর এই প্রথম হাসি-তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরে যন্ত্রণাও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন—"আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা, আজি কাঁদিও না—আমি মরিলে পর কাঁদিও—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়টা কথা কহিতে পারি, নির্বিঘ্নে কহিয়া মরিব সাধ করিতেছি।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল—"আর একটি ভিক্ষা, তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।" যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না?" যামিনী বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানালাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানালার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানালায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজ সাত বৎসর ভ্রমর সে জানালার দিকে যান নাই—সে জানালা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সে জানালা খুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাহাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই "

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজ আবার আমার ফুলশয্যা ?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস-দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি ?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।' কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম। এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। বলিল—"কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি, ইহজন্মে আর একবার দেখি। এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুই জনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না। ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল, ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল।

গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রোহিণীকে গোবিন্দ-লাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস, খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে। দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্ধমৃতবৎ আছে,—কিন্তু আর তাহাতে ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল, রৌদ্রের অত্যন্ত তেজ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া, বারুণীপুষ্করিণীর তটে গেলেন। বেলা

দেড় প্রহর হইয়াছে। ঘাট হইতে যেখানে বারুণী তীরে তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহ-নির্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্তে কঞ্চির বেড়া। সে বাগানে আর ফুল ফুটে না, ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্যের তেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়! রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণীকে ভাবিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল; সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন! কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না!

সাত বৎসরের পর তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

সমাপ্ত